International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-III, May 2026, Page No. 21-31
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.03W.319

উদ্যানচর্চার চর্চার ইতিহাসে শ্রীরামপুর: প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব, দেবানুগত সংগ্রাহক গোষ্ঠী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভারতীয়করণ

আকাশ ভট্টাচার্য্য
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 14.05.2026; Accepted: 19.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores the early nineteenth-century horticultural history of Serampore, focusing on the botanical endeavours of William Carey and the Baptist Mission. Unlike the rigid, institutionalized imperial botany of the era, Carey established a five-bigha botanical garden driven by an informal network of devout collectors, friends, and family spread across the globe. For Carey, the expansion of Western science was deeply intertwined with Protestant Christian theology and was viewed as essential for the upliftment of the local population. Through an early application of "liberation theology," he sought to alleviate the poverty of Indian peasant farmers by introducing improved agricultural productivity, often blaming the Zamindar class for their agricultural misery. A central theme of Carey's work was the "Indianization" of Western science. To make scientific knowledge accessible and culturally legitimate, the Serampore missionaries created a mixed knowledge system. They translated botanical texts into Bengali, utilized both Western and local medicinal plant knowledge, and even incorporated traditional Indian agricultural practices from texts like the Agni Purana. Furthermore, the article highlights the indispensable role of indigenous gardeners (malis), such as the chief gardener Haldhar, who mastered the Latin nomenclature of plants and drove the local popularization of horticulture. Ultimately, Carey's botanical pursuits transcended mere imperial or economic interests; they were fundamentally rooted in a religious commitment to local development and a genuine quest for knowledge, profoundly shaping Serampore's ecological and social landscape.

Keywords: William Carey, Serampore Mission, Horticultural History, Indianization of Science, Colonial Botany

গঙ্গাতীরের সুরম্য উদ্যান, প্রকৃতির রং যেন তার সীমানা ছাড়িয়ে স্বর্গের সাথে খানিক বার্তালাপ চালায় এখানে, দেশ-বিদেশের ফুলে-ফলে সেজে ওঠা বিঘা পাঁচেকের টানে ছুটে আসেন নানান অঞ্চলের লোকজন, চর্চা চলে, রহস্য জানবার নিরলস চেষ্টা করা হয়, বাগান কর্তা উইলিয়াম কেরিকে সম্মুখীন হতে হয় নানান প্রশ্নের, তিনি উত্তরে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণের কথা জানান, শ্রম বর্জিত জীবনের অসারতার কথা বলেন, বিজ্ঞানের করুণা কেমন করে তার বাগান চর্চার সহযোগী হয়ে উঠলো সেই কিস্যা কিছু বলে ওঠেন। উনিশ শতকে এমন করে কৌতূহল দানা বেঁধেছিল কেরি সাহেবের উদ্ভিদ উদ্যানকে কেন্দ্র করে। উক্ত শতকের একেবারে সূচনালগ্নে কেরি সাহেবের উদ্যান কর্মের সূত্রপাতের পর থেকে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে শ্রীরামপুর উদ্যান, অচিরেই তৈরি হয়ে গিয়েছে এক নব্য জ্ঞানতন্ত্রের, সাম্রাজ্যিক ধারাপাতের পোশাকি নৈর্ব্যক্তিকতাকে কিঞ্চিৎ সাথে রেখেও বিশ্বজোড়া প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার চিরন্তন ভাবে ভাটা পড়েনি কখনই। কেরি ও

তার সহযোগীদের উদ্যানবিদ্যার প্রতি অবিরাম উৎসাহ ও নিত্য শ্রমের কারণেই গাছেদের চর্চা সাধারণ জনজীবনের অংশ হয়ে উঠতে পেরেছিল, বাগান চর্চা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সামাজিক সৌষ্ঠব প্রকাশের এক অব্যর্থ মাধ্যম, বাহুবলের সাথে সাথে সৃজনের অর্থেও পৌরুষের যোগ স্থাপিত হয়, বিদ্যার সর্বস্তরে বিস্তারের প্রতি কেরির যে আজীবন সমর্পণ তাই এক নতুন গাছ কেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়াশীল স্থানীয় ধারার জন্ম দেয় বলে অনুমান করি, কৃষ্টির উত্তর কৃষ্টির মধ্যে দিয়ে করবারই এক সংকল্প গ্রহণ করেন ভারতীয়দের একাংশ, যদিও কেরির লক্ষ্য এই সু-সংগঠনকে ভেবেই সৃষ্টি হয়েছিল, এ কথা বলা যাবে না বরং তার নজর সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নের সাথেও জড়িত ছিল, সুন্দর সাজানো বাগানের পাশে রোজনামচায় উপকারী বন্ধু গাছেদের প্রচারেই তার মন ছিল বেশি, খ্রিস্টের থেকে পাওয়া বিজ্ঞান দিয়ে উন্নয়নের কর্মসূচীই ছিল তার জীবনের মুখ্য, উচ্চবিত্তদের শৌখিনতার জায়গা দেখে কেরি বারবারই সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন, যদিও অসম প্রতিযোগিতা ও ব্রিটিশ সরকারের অসৎ ব্রত স্বার্থের দেওয়ালকে নড়তে দেয়নি। বর্তমান আলোচনায় উনিশ শতকের শুরুর দিকের শ্রীরামপুরে চলতে থাকা এই কর্মযজ্ঞের দিকেই খানিক দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, বাগান চর্চার খুঁটিনাটি যেমন বিশেষ স্থান রাখবে তেমনই মিশনারীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার আঙ্গিক থেকে তৎকালীন উদ্ভিদবিদ্যার জগৎকে কিছুটা জরিপ করবার চেষ্টাও জড়িয়ে থাকবে। সামাজিক প্রতিপত্তি চরিতার্থ করবার চেতনা ও নিম্নবিত্তদের জন্য কেরির বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নয়নের সাথে ধর্মের ভালোবাসা বা করুণার যোগসূত্রতা অনুধাবনের প্রয়াস এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাগান শুধু বাগানেরই কথা বলবে না বরং তাকে ঘিরে তৈরি হতে থাকা বাঙালি সমাজের ভিন্ন চরিত্রের এক সময়ের গল্পও আমরা তার কাছ থেকে শুনতে পাবো আশা করি।

প্রাথমিক নকশা ও ধর্মভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চা:

কেরির প্রকৃতি এষণার কালবিবরণী এস্থানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, আকস্মিক কোনো আলোরেখার আবির্ভাব নয় বরং মনের মধ্যে সদা উজ্জ্বল প্রকৃতি প্রেমের উপস্থিতি তাকে ধাবিত করেছিল নানান অজানার খোঁজে। যান্ত্রিকতার সাত পাঁচ থেকে বেশ কিছুটা দূরে পলার্সপুরীর মতো পল্লী গাঁয়ে বেড়ে ওঠা কেরির হৃদয়ে প্রকৃতি অনুভবের এক অনন্য জায়গা ছিল, কাকার হাত ধরেই চিনতে শুরু করেছিলেন আশপাশের উপাদানগুলোকে, আপন অস্তিত্বের আনন্দরূপ খুঁজে বের করবার যে অসাধারণ দক্ষতা কেরি অর্জন করেছিলেন তা তাঁর আপাত দৈন্যকে অনেকাংশেই নিবারিত করতে পেরেছিল। বিশ্বাসের মন্ত্রেই আপনার ভাঙাচোরা জীবনে জ্ঞানের সাধনার বিশেষ অঞ্চল প্রস্তুত করেছিলেন, আর্থিক অনটন তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার অন্তরায় হলেও জ্ঞান পিপাসার ক্ষেত্রে বাধ সাধতে পারেনি, খোলা প্রকৃতিই ছিল তাঁর পরীক্ষাগার, খেলার ছলে নিজের শয়ন কক্ষকে অচিরেই বদলে ফেলেছিলেন এক খামখেয়ালি সংগ্রহশালায়। বীজ ,লতাপাতা, পোকামাকড়ের মতো আপাত সাধারণ জিনিসপত্রের মধ্যেই তিনি জীবনের আসল রসের উৎস পেয়েছিলেন। এমন চারিত্রিক গড়নের দৌলতে কেরি বহু প্রতিকূলের মাঝেও আপন সাধনা বজায় রাখবার জোর পেয়েছিলেন, জ্ঞানের প্রতি অসীম উৎসাহ তাকে জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এহেন প্রকৃতি অনুসন্ধিৎসু ও বিশ্বাসী কেরি বয়স বাড়ার সাথে সাথেই যুক্ত হয়ে পড়লেন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের কার্যকলাপের সাথে, পর্যায়ক্রমে সমাজের নানা কাজে তার নিযুক্তি হলো, শিশুদের ভূগোলের পাঠদান করতে করতে পরিচিত হলেন বিশ্ব মানচিত্রের সাথে, খুঁজে পেতে শুরু করলেন নতুন নতুন অস্তিত্বের কথা, চেতনার সীমারেখা হঠাৎই গতি নিয়ে বহুধা প্রসারিত হলো, বাইরের জগৎকে জানবার এক অদম্য ইচ্ছে জেঁকে বসতে শুরু করলো, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন জগতের ওপারের পীড়িত মানবসমাজের জন্য, বিধর্মের আঁধার কল্পনা তাকে তাঁর ধর্মই শিখিয়েছিল, বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা মিশনারীদের "হিদেন" ভূমির উদ্ধার কার্য কিংবা ধর্মীয় রোমাঞ্চ অভিযানের কথা কেরির মধ্যে সঞ্চার করেছিল এক নতুন উন্মাদনার (কেরি, ১৭৯২, পৃ. ৩৯-৬২), অজ্ঞদের

অন্ধকার জগতে আলোর দিশারী হওয়ার সংকল্প নিয়েই চেপে বসলেন জাহাজে, প্রথমে তাহিতি যাওয়ার অভিপ্রায় থাকলেও পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত বদলে চলে আসেন ভারতে (মার্শম্যান, ১৮৫৯, পৃ. ৮), আসা ইস্তক প্রতিকূলতা নিত্যদিনের সঙ্গী হলেও, আপনার চর্চার জায়গা থেকে কখনোই সরে আসেননি কেরি, খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও স্থানীয়দের উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত কেরি প্রতিদিন লড়াই করেছেন। ধর্মপ্রচারে তৎকালীন সময় নিষেধাজ্ঞা থাকায় মিশনারী হিসেবে কোনরূপ আনুকূল্যই তিনি লাভ করতে পারেননি বরং শুরুর দিনগুলো ছিল বেশ দুরূহ। স্থানীয় জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্প্রসারণকে অন্যতম শর্ত হিসাবে অনুধাবন করেছিলেন উইলিয়াম কেরি, তবে এই বিজ্ঞানের প্রচারের সাথে নিবিড়ভাবে যোগ ছিল ধর্মের। অধুনা বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুটি বিষয় পরস্পরের থেকে ভীষণরকম বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, আঠারো শতকে চিত্রটা এমন ছিল না, বিজ্ঞানের ধারণা তখনও এতটা সংকীর্ণ হয়নি বরং সামগ্রিক জ্ঞান আহরণের সাথেই যুক্ত করা হত বিজ্ঞান বা সায়েন্স শব্দটা। সায়েন্সের জার্মান প্রতিশব্দ হিসেবে উইসেনসাফট (Wissenschaft) শব্দটি সেই সময় বেশ প্রচারের আলো পায়, এ শব্দ সামগ্রিক জ্ঞান অনুসন্ধানের পদ্ধতিকেই সূচিত করে। তৎকালীন সময়ে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল প্রকৃতি পরিচয় বা উদ্ভিদবিদ্যার মতো বিষয়। বিষয় হিসেবে প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History)-র যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল ইউরোপ জুড়েই, কেরি ভারতে আসার আগে থেকেই আপন পরিবারের মধ্যে এই চর্চা প্রবিষ্ট করাতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, শ্রীরামপুর থেকে আত্মীয়দের পাঠানো অসংখ্য চিঠিতে কেরির এই বিষয়ে অতি সচেতনতা প্রকাশ পায়। প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে এই প্রকৃতিচর্চার প্রবণতা ভীষণভাবেই লক্ষ্য করা যায়, বিজ্ঞানের যুক্তি আঠারো শতকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করে চলে যায়নি, বরং বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। জ্ঞান সংগ্রহ ও তার সঠিক প্রচারকে তারা খ্রিস্টের কাজ হিসেবেই দেখতেন, কেরিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন খ্রীস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার কখনোই সম্ভবপর হবে না। বিজ্ঞানের প্রসার ও ধর্মের বিস্তার অনেকটা সমার্থক ছিল তাঁদের কাছে, পাশ্চাত্য ধারার লোকজনদের কাছে প্রাচ্যের মানুষজনেরা মূলত প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন, পূর্বতন পর্যটকদের বিবরণী অনেকাংশেই এই ভাবধারা তৈরি করেছিল, এক তুলনামূলক ধারার প্রবর্তনের দিকে যাওয়া হল যাতে অপরকে

নিম্নস্তরীয় প্রমাণ করতে সুবিধে হয়, ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা জায়গা পেয়েছিল উদ্ভিদ চেতনাতেও, আঠারো শতকের শেষ থেকেই আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে "উন্নয়ন" বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য প্রদান করা হয়, এই সময়টিকে ব্রিটিশরা উন্নয়নের যুগ আখ্যায়িত করেছিল, জাত্যাভিমান প্রদর্শনের এক নতুন পরিসর লাভ করতে মূলত এই প্রয়াস, "অপর" প্রাচ্যের যাবতীয় বিষয় এমনকী উদ্ভিদেরও পাশ্চাত্যের তুলনায় নিম্নমানের আখ্যায়িত করা শুরু হয়, এই সময় গাছেদের ক্ষেত্রে "জাত" শব্দটিকে কাজে লাগানোর চল চোখে পড়ে, প্রজাদের মতো গাছেদেরও অনেক ক্ষেত্রে নীচু জাতির তকমা দেওয়া হয়। উইলিয়াম কেরির ক্ষেত্রেও এই ধরণের পক্ষপাত মূলত তার চর্চার প্রথমদিকে বেশি করে চোখে পড়ে, যদিও সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান আহরণই হয়ে ওঠে তাঁর মূল উদ্দেশ্য। কেরির এদেশে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চার শুরু মূলত মদনাবতীর সময়কাল থেকে, আঠারো শতকের একেবারে তাঁর শুরুতেই অঞ্চলে গাছ সংক্রান্ত নানান উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়ে, ব্রিটেনে বেরাদরদের লেখা চিঠিতে বারবার তিনি সে দেশের উন্নত যন্ত্রপাতি, নানান ফুল-ফলের চারা প্রত্যাশা করেছেন। ভারতে জন্মানো নানান সবজি, ফলের ধারা বিবরণীও তাঁকে দিতে দেখা যাচ্ছে, ১৭৯৬ সালে ফুলারকে লেখা চিঠিতে এ দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে কেরি সীমাবদ্ধতার কথাই জানাচ্ছেন মূলত, এই লেখাতে আমরা চার ধরণের কচু, নটে শাকের বেশ কিছু ধরণ, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতির কথা পাই,

এর পাশাপাশি তিনি যে ধীরে ধীরে লাল শাককে নিজের খাদ্যে ঠাঁই দিতে শুরু করেছেন তাও এই চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে (স্মিথ, পৃ. ৩০০)।

বাংলার মূল খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের উল্লেখ তার নানান লেখায় দ্রষ্টব্য, নিম্নমানের গম নিয়ে কেরি বেশ দুশ্চিন্তাতেই পড়েছিলেন, তড়িঘড়ি ইংল্যান্ড থেকে অধিক সফেদ গমের বীজ আনানোর ব্যবস্থাও তাকে করতে দেখা যায় (স্মিথ, পৃ. ৩০১)। মদনাবতীর সময়কালেই কেরির মোলাকাত হয়েছিল স্থানীয় মালী সম্প্রদায়ের সাথে, সাময়িক ভাবে এদের অদক্ষ বললেও (শিবাসুন্দরম, ২০০৭, পৃ. ১২১), তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড দেখলে তাতে মালীদের উপযোগিতা নেহাত মন্দ নয় বরং এরাই হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী, অজ্ঞ কৃষকের বদলে কর্মদক্ষ মালীদের বেছে নেওয়ার মূল কারণই ছিল ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন, কেরি এদেশে এসেই বুঝতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্যের প্রণালীকে যদি এদেশের প্রয়োজন মতো গড়ে পিঠে না নেওয়া হয় তাহলে প্রকৃত ফলাফল লাভ করা সম্ভব হবে না। মদনাবতীর সময় থেকেই সেসব বুঝে তার চর্চায় বদল আসতে থাকে, তবে তাঁর শিক্ষার মূল প্রভাব পড়ে শ্রীরামপুর উদ্ভিদ উদ্যানে, মিশ্রিত ব্যবস্থার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ কোনোভাবেই নজর এড়ায় না। শুধু উদ্যান চর্চাই নয়, নানান ভাবে তিনি কৃষিজীবীদের সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে তৎপর হন। জমিদারদের অসম সংসারে প্রজা কৃষকদের করুণ অবস্থার বদল ঘটাতে উৎপাদনশীলতার মতো বিষয়কে বিশেষভাবে প্রচারে আনা হয়, সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে এক নতুন মুক্তির পথ বাতলে দেন কেরি, চাষের উন্নয়ন সাধনকারী বিজ্ঞানকে খ্রীস্টধর্মের দান হিসেবেই দেখানো হয়, নিম্নবিত্ত ও নিম্নজাতির লোকজনের এই দৈন্য মোচনের মধ্যে দিয়ে খ্রীস্টধর্মের ভিত্তি মজবুত করার স্বপ্ন শ্রীরামপুর মিশন দেখেছিল, যদিও এর সফলতা কতটা ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। এই সময়ে "মুক্তি ধর্মতত্ত্বের" বিশিষ্ট প্রয়োগ আমরা কেরিদের তরফ থেকে লক্ষ্য করতে পারি। পূর্বে বেশ কিছু রচনায় কেরিকে মূলত সাম্রাজ্যিক উদ্ভিদ বিদ্যার স্বাভাবিক সদস্য হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হলেও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। কেরির চর্চায় অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানতত্ত্বে অংশগ্রহণের জায়গা ছিল; ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কাষ্ঠসম্পদ বৃদ্ধির মতো নানান ক্ষেত্রে কেরির নিযুক্তি চোখে আসে, শুধু কেরিই নন বরং শ্রীরামপুর মিশনের অন্যান্য সদস্যদেরও একই ভাবে সরকারি ক্ষেত্রে যোগদান লক্ষ্য করতে পারি, তবে শুধু ব্রিটিশরা বা ব্রিটিশ কোম্পানি নয়, সেই সময়কার বেশ কিছু ভারতীয় উচ্চবিত্ত ব্যক্তিত্বদেরও আমরা শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখতে পাই, এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে আদর্শগত পরিসর নিয়ে পুনর্বিবেচনার করবার দরকার রয়েছে, শ্রীরামপুর মিশন একেবারে প্রথম দিন থেকেই নিজেদের আর্থিক জমিন মজবুত করতে চেয়েছিল, মূলত বাহ্যিক প্রভাব থেকে মিশনের কাজকে মুক্ত রাখতেই। এই আর্থিক দৃঢ়তা তৈরি করতে তাঁরা কোম্পানির কাজ কিংবা দ্বারকানাথদের সাহায্য নিতেও পিছুপা হননি, কিন্তু এই সহাবস্থানের পাশাপাশি বিরোধের জায়গাগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলে শ্রীরামপুর মিশনের ব্যতিক্রমী চরিত্রের আঁচ আরো কিছুটা পাওয়া যাবে। ১৮৩০ র দশকে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে যখন কোম্পানি অর্থকরী ফসল উৎপাদনের উপর জোর দিতে শুরু করলো, সেই সময় উইলিয়াম কেরি এই সমাজের সবরকম পদ থেকে অব্যাহতি নেন (তাবোলাচ্চি, ২০১৯, পৃ. ৪০-৪১), তাঁর রায় সবসময়ই খাদ্যফসল ও ঔষধি গাছপালা জনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকেই বহাল ছিল। শুধুমাত্র কোম্পানিই নয় ভারতীয় উচ্চবিত্তদের সাথে জমির কর সংক্রান্ত বিষয়ে বাদানুবাদে জড়াতেও দেখা যায় শ্রীরামপুর মিশনারীদের, উইলিয়াম কেরি তার নানান ভাষণে কৃষকদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে জমিদার গোষ্ঠীকেই দেখিয়েছেন (কেরি, ১৮২০, পৃ. ৫২), জমির উন্নয়ন জনিত বিষয়ে তাঁদের উদাসীনতার কারণেই এ দেশের কৃষিজীবীদের করুণ অবস্থা বলেই তিনি জানাচ্ছেন। এই দ্বন্দ্বিক পরিস্থিতিই কেরিদের অন্যরকম আদর্শের পরিসর সম্বন্ধে

ধারণা, কেরিদের উদ্ভিদবিদ্যা চর্চার ব্যতিক্রমী দিক শ্রীরামপুর উদ্যানের অনুশীলনে ভালোভাবেই অনুধাবন করা যায়, ধর্মীয় আদর্শ ও উপকারের মানসিকতা তাঁদের চর্চাকে একটা আলাদা রূপ দিতে পেরেছিল।

শ্রীরামপুর উদ্যান ও দেবানুগত সংগ্রাহক গোষ্ঠী:

উনিশ শতকের একেবারে শুরুর দিকেই ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাঁচ বিঘা জমির উপর উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুর উদ্ভিদউদ্যান তৈরি করেছিলেন, যা বর্তমানে ইন্ডিয়া জুটমিল এলাকা। পিয়ার্স কেরির বিবরণ অনুযায়ী এই বাগানে একদিকে যেমন ছিল সুউচ্চ স্থানীয় গাছসমূহের আবাসস্থল তেমনই ছিল বিদেশি উদ্ভিদের সমারোহ, জলজ উদ্ভিদের জন্য ছিল দুটি বৃহৎ মাপের জলাশয় (কেরি, ১৯৪২, পৃ. ১১৫)। ছায়াবিথীর পরিকল্পনা করা হয়েছিল এই গাছেদের বিশেষ বিন্যাসের মাধ্যমে, এই সজ্জার হদিশ বর্তমানেও কলেজ প্রাঙ্গনে লক্ষ্য করা যায়।

পিপুল, তেঁতুল, খেজুর, নারকেল সহ আরো অনেক গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত শ্রীরামপুরের এই বাগানে, সব গাছগুলিই ছিল বৈজ্ঞানিক ভাবে নামাঙ্কিত, যা আজও কলেজ প্রাঙ্গণে গেলে চোখে পড়বে। রেডউড, স্যাটিন উড, দেবদারু, অ্যাডেনথেরা, ইউক্যালিপটাস, কাঁঠাল প্রভৃতি সে বাগানে ছিল,যদিও ক্যারিবিয়ান থেকে বন্ধু রক্সবার্গের সূত্রে কেরি মেহগনি গাছ লাভ করার পর থেকেই সে গাছ আকর্ষণের একেবারে কেন্দ্রস্থলে জায়গা পেয়েছিল (কেরি, ১৯৪২, পৃ. ১১০)। একদিকে হিমালয় অঞ্চল থেকে যেমন এসেছিল রডোডেনড্রন তেমনই ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল নার্গিস (narcissi), আইরিশ, হিকান্তিস প্রভৃতি। মুলা, স্ট্রবেরী, লেটুসের মতো নানান ফসলের আমদানি ঘটেছিলো বাইরে থেকে। শুধুমাত্র সবজিই নয় বরং চেরি, নাশপাতি, বরই (plum) প্রভৃতি ফলের ফলনও শুরু হয় ,তবুও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আম, একেই ফলেদের মধ্যে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, মালিদের সর্বক্ষণ এর উপর বিশেষ নজর থাকতো। শুধুমাত্র আমদানিই নয় বরং 'আমাদা' র মতো কিছু প্রজাতি ও রডোডেনড্রনের মতো কিছু গাছ লিভারপুলের বাগানে বন্ধুদেরও পাঠান কেরি। মিশনের রান্নাঘরের বাগানে বাঁধাকপি ফুলকপি, গাজর, সেলেরি, বিট প্রভৃতি ফলানো হত। এছাড়াও পিয়ার্স কেরী জায়ফল, কফি, ক্যাপসিকাম, লবঙ্গ প্রভৃতির ফলন পরীক্ষামূলক স্তরে দেখেছিলেন (কেরি, ১৯৪২, পৃ. ১১১), এই বাগানের দিকে তাকালেই বিদেশি ও এদেশীয় গাছেদের সুখী সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় যা এখানকার বিদ্যার স্বতন্ত্রতার নিরিখে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, এর পাশাপাশি বিদেশ থেকে ওষুধ আনবার অনিশ্চয়তার কথা মাথা রেখেই কেরি গড়ে তুলেছিলেন ঔষধি উদ্ভিদের বাগান, অনেকেই একে শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের চিকিৎসার সুবিধার্থে তৈরি হওয়া একটি প্রজেক্টের নিরিখে দেখেন, সেকথা সর্বাঙ্গীন অসত্য না হলেও, একথাও সত্য যে এই ঔষধি বৃক্ষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে কবিরাজি শাস্ত্রের গুরুত্বকেও অস্বীকার করেননি। এক্ষেত্রে ফিলিক্স কেরির বাংলায় রচিত ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার বই 'বিদ্যাহারাবলী' ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'হিন্দুস্তানের ক্ষেত্র বাগানের বিবরণ' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, এই বইগুলিতে ধাত্রীবিদ্যা ও অগ্নিপুরানের মতো গ্রন্থগুলির জ্ঞান জায়গা পেয়েছিল, মূলত পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানের বইতে এই ধরনের প্রাচীন বিদ্যার উল্লেখের পিছনে পশ্চিমী বিদ্যাকে বৈধতা প্রদান করার জায়গা যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের ভাষা ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সম্মান দেখানোর প্রয়াস। কেরিদের এই সহিষ্ণুতা তাদের উদ্যানচর্চাকে এক অভিনব পরিসর প্রদান করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেরির শিবপুরের কলকাতা বোটানিক গার্ডেনের সাথে আদান প্রদানের সম্পর্ক থাকলেও সেই বাগান শ্রীরামপুর উদ্যানের চরিত্র কখনোই স্থির করে দেয়নি, জোসেফ ব্যাঙ্কসের মতো কর্তাব্যক্তির পরিকল্পনায় যে সাম্রাজ্যিক উদ্ভিদবিদ্যার প্রসার সেকালে ঘটেছিল, তাতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতিরেকে অন্যদের তেমন কোনো জায়গা ছিল না, কঠিন শৃঙ্খলার ঘেরাটোপে রক্ষিত ছিল কোম্পানির সেসময়কার নানান

প্রান্তের বাগান, অপ্রাতিষ্ঠানিক যোগ তৈরি হলেও সেসময়কার কলকাতা উদ্যান, লন্ডনের কিউ গার্ডেন সেইসব সম্পর্ক সম্বন্ধে খুবই উদাসীন থাকতো। উইলিয়াম কেরি বা শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চর্চা বরং অনেক উন্মুক্ত ছিল, এঁদের মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সাথেই যুক্ত করা চলে, জ্ঞানের প্রতি এই ধারার লোকজনদের নিরন্তর উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো, যদিও আনন্দ লাভের সাথে সাথেই যুক্ত ছিল ধর্ম অনুশীলনের জায়গাও, পিয়ার্স কেরি তাঁর লেখাতে কেরির উদ্যানচর্চা জনিত আনন্দ লাভকে নিছক মজার ছলে না দেখে ধর্মের গভীরতার দিক থেকে দেখতেই উপদেশ দিয়েছেন (কেরি, ১৯২৩, পৃ. ৩৮৯-৯৯)। যেখানে সাম্রাজ্যিক উদ্ভিদ বিদ্যায় সংগ্রাহকদের ভূমিকায় মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিত্বদেরই দেখা যেতো, সেখানে কেরিরা বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বেরাদরবর্গ ও পরিবারের লোকজনদের সহায়তায় গড়ে তুলেছিলেন এক বৃহৎ বিনিময় মাধ্যম। কেরি রক্সবার্গের হর্টস বেঙ্গলেন্সিসের ভূমিকায় ইউরোপীয় উদ্ভিদবিদ্যা বা বোটানির আকর হিসাবে এশিয়া,আমেরিকা ও আফ্রিকায় স্থিত সর্বজনীন ও ব্যক্তিগত বাগানগুলিকেই চিহ্নিত করেছেন।

কেরির এই সংগ্রাহকদের বিস্তৃতি ছিল বিস্ময়কর; ইংল্যান্ডের নানান প্রদেশ, আমেরিকা, এমবয়না (ইন্দোনেশিয়া), অস্ট্রেলিয়া, সিলেট, বার্মা, নেপাল, মরিশাস প্রভৃতি অঞ্চলে কেরির সংগ্রহকারীদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। কেরির গাছের জন্য আবেদন করা চিঠিতেও জ্ঞানের সাথে ঈশ্বরের যোগের কথা বারবার স্থান পেয়েছে, কেরি নিজের পরিবারের মধ্যে প্রাকৃতিক ইতিহাস চর্চার প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে দৈব গুণাবলী প্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন (শিবাসুন্দরম, পৃ. ১১১-১৪৫)। কেরি স্থানীয় সংগ্রাহকদের উপর ততটা ভরসা না করতে পারলেও, সেসময়ের নানান লেখা থেকে সুন্দরবনের নরোত্তম ভুঁইঞা, সিলেটের রামনাথ, প্রেমচাঁদ, রাম সিংদের কথা বেশ কিছুবার সামনে আসে (তাবোলাচ্চি, ২০১৯, পৃ. ১৬৬), কেরি মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক ইউরোপীয় উৎসাহীদের সাথে করেই এই চর্চা চালাতে থাকেন, অচিরেই এই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে কঠিন শৃঙ্খলার পাশে জায়গা পায় আবেগের মতো বিষয়; বীজ, চারাগাছ, এক বীজের শুকনো ফল প্রভৃতি উপহার বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই উদ্ভিদবিদ্যাচর্চা নতুন গতি পেতে শুরু করে এ সময়। উদ্ভিদচর্চার এই পর্যায়ে কেরির সাথে ইংল্যান্ডের প্রাতিষ্ঠানিক বোটানির জোসেফ ব্যাঙ্কস, উইলিয়াম হুকারের মতো লোকজনদের আংশিক যোগসূত্র স্থাপিত হলেও, সেখানকার মিডল্যান্ডের তুলনামূলক স্বল্প পরিচিত অপ্রাতিষ্ঠানিক চর্চাকারীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের নিবিড়তা অনেক বেশি ছিল। লিভারপুলের রস্কো ও শেফার্ডের সাথে কেরির সম্পর্ক এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এক্ষেত্রে, কেরি লিভারপুল থেকে নানান সময় বীজ আমদানি করেছিলেন মূলত বন্ধুত্বের খাতিরেই, এমনকি এঁরাও লিভারপুল উদ্যানের গঠনে কেরির অবদানকে বারবার স্বীকার করে নিয়েছেন। আঠারো শতকের শেষ থেকেই কেরি ইংল্যান্ডে বীজ, উন্নত যন্ত্র প্রভৃতির জন্য চিঠি লিখতে শুরু করেন, ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন রাইল্যান্ড, বেরাদর ফুলার, মরিস প্রমুখদের সাথে চিঠি আদান-প্রদানে উপহারের আর্জির পাশাপাশি থাকতো ভারতীয় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা। কেরি প্রথম দিন থেকেই এ দেশের কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে ভীষণরকম সন্দিহান ছিলেন, তাই শুধু বীজ, চারাগাছ নয়; পাশাপাশি সেখানকার কাস্তে, কাঁচি, লাঙ্গলের চাকা প্রভৃতি প্রেরণেরও দাবি করেন। ১৮১১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে লেখা তাঁর প্রতিবেদনেও ভারতীয় কৃষি যন্ত্রাদির সমস্যা নিয়ে তাকে লিখতে দেখা যায়,এদেশের লাঙ্গলের কারণে উৎপাদনও যে অনেক কম হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন (কেরি, ১৮১১, পৃ. ১-২৬)। উন্নয়নের চেতনা এই আদান-প্রদানের মধ্যে ভীষণভাবে থাকলেও, কেরিদের ক্ষেত্রে উন্নয়নের সংজ্ঞায় ধর্ম একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল ও তাতে মানবিক জায়গা বা সহিষ্ণুতার প্রশ্নই ছিল জোরালো। কেরির সাথে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চিঠি চালাচালি হয়েছিল তার পুত্র জাবেজ কেরি ও অস্ট্রেলিয়ার মিশনারী রোল্যান্ড হাসেলের। তবে ফিলিক্স কেরিকেও তাঁর কর্মজীবনের প্রথমদিকে আমরা উদ্ভিদ বিদ্যা নিয়ে বিশেষ

উৎসাহ নিতে দেখতে পাই, চিঠিপত্রের সূত্রে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ না মিললেও, রক্সবার্গের ফ্লোরা ইন্ডিকাতে পেগু থেকে চিহ্নিত কয়েকটি গাছের অবদানকারীর নামের স্থানে ফিলিক্সের নাম জ্বলজ্বল করছে, এর থেকেই তাঁর অবদান সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করতে পারি। এমবয়নাতে থাকাকালীন জাবেজকে শুকনো বীজ, চারাগাছ, ঝিনুক, খনিজ প্রভৃতি পাঠানোর জন্য আবেদন করেন কেরি, এমনকি সেই সময় কেরি পাখিদের জীবন্ত আমদানি করবার জন্যেও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। শুধুমাত্র আমদানিই নয় বরং আমদানিকৃত সেসব গাছেদের এদেশে বৃদ্ধি নিয়েও নিয়মিত লিখে পাঠাতেন ছেলেকে, এমনভাবেই ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত মংগোস্টিন গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণমূলক লেখাও তাকে পাঠাতে দেখা যায়। জাবেজের আজমেরে চলে আসার পর পরই কেরিকে সুপারি গাছের চারা পাঠাতে দেখা যায়, কেরির আরো কিছু লেখায় এই সুপারি গাছ পাঠানোর কথা আমরা পাই, এই গাছটিকে পাঠানোর তাড়াতাড়ি দেখে এ গাছের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। এই পর্যায়ে কেরি শ্রীরামপুর থেকে বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তি ব্যাপ্টিস্ট মিশনের অন্যতম কেন্দ্র ব্রিস্টলে পাঠান, এর পাশাপাশি জাবেজের সূত্রে ইন্দোনেশিয়া থেকে পাওয়া ঢাল-বল্লম সহ বেশ কিছু জিনিসপত্রও তিনি সেখানে প্রেরণ করেন (শিবাসুন্দরম, পৃ. ১২৫), গাছও এর ব্যতিক্রম ছিল না, ইতিহাসবিদ সুজিত শিবাসুন্দরম এই রপ্তানিকে মিশনারীদের বিধর্মী সংস্কৃতি জয়ের চিহ্ন হিসেবে দেখেছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যেমন করে তাদের উপনিবেশ থেকে সঙ্গে করে আনা সংস্কৃতির নানান জিনিসকে জাত্যাভিমান বা জয়ের সাথে সমার্থক করে দেখেছিল, মিশনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ আলাদা এক ক্ষমতার জগতের অস্তিত্ব আমরা পাই, এই উদাহরণের উপর ভর করে সাম্রাজ্যিক বিদ্যার থেকে শ্রীরামপুরের চর্চাকে ভিন্ন করা যায়, যার আধার ছিল ধর্ম। অস্ট্রেলিয়ার নিউ হল্যান্ড মিশনারীর সাথে গাছ সংক্রান্ত যোগাযোগ ,স্থাপনের বিশেষ উৎসাহ সেসময় তিনি অনুভব করেছিলেন (ম্যানলি, ২০০৪, পৃ. ৩২৬-৩৪৫), লিভারপুলের পূর্বোক্ত দুজনের পাশাপাশি লর্ড ফিৎজউইলিয়াম ও তাঁর প্রধান মালী জোসেফ কুপারের সাথে কেরির নিবিড় যোগ ছিল। কেরির চিঠি থেকে কাউস্লিপস, ফিল্ড ডেইজি, ব্লু-বেল, ক্র-ফুটস,টিউলিপ, ড্যাফোডিলস, স্নো ড্রপ, বেলিস পেরেনিসের মতো ইংলিশ ফুলের আমদানির কথা যায়, সাথে এসেছিল ইংল্যান্ডের বেশ কিছু ফল গাছও (নাগার, ২০১৩, পৃ. ১৫৩)। কেরি শুধুমাত্র সাম্রাজ্যিক উদ্ভিদবিদ্যার অন্যতম অংশ শ্রী / ১৮৯ 'সংগ্রহ'-র ধারণাতেই বদল আনেননি, এছাড়াও তিনি তৎকালীন ইউরোপ কেন্দ্রিক উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞানতত্ত্ব ও তার প্রকাশনার স্বাভাবিক শৃঙ্খলে ছেদ ফেলেন।

কেরির রক্সবার্গের হর্টস বেঙ্গলেন্সিস ও ফ্লোরা ইন্ডিকা শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশ করার আগে অবধি, ভারত থেকে আহরিত যাবতীয় তথ্যকে লন্ডনের কিউ গার্ডেনের হাতে সঁপে দেওয়া হতো, সেখানে নানান সংশোধনের পরে ছাপার অক্ষরে সেসব কিছু প্রকাশ পেতো, ল্যাটিন ভাষার ব্যবহারই ছিল প্রধান, তবে কেরি সর্বপ্রথম এতে ছেদ ফেলেন। বন্ধু রক্সবার্গের দুটি অমূল্য কাজকে কেরি ছাপার আকারে প্রকাশ করেন, উল্লেখযোগ্য ভাবে এই বই দুটিতে গাছের নামের ক্ষেত্রে ইংরেজি,ল্যাটিনের পাশাপাশি বাংলার ব্যবহারও দেখা যায়, এসব কিছুই মিশনের উদ্ভিদ চর্চার পরিসরটিকে অভিনবত্ব প্রদান করেছে। অপরের জ্ঞানের প্রতি সহিষ্ণুতা ও পরিস্থিতি বুঝে এক মিশ্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথাও কেরির মাথায় এসেছিল এ নিয়ে সন্দেহ নেই, এই সহিষ্ণুতার মধ্যে অবশ্যই ছিল ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যও, স্থানীয়দের সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে কেরিরা তাদের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন, তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রেখেই তুলনামূলক আলোচনা তাঁরা টানতে আগ্রহী হয়েছিলেন, ভারতীয় হিন্দু ধর্মের মূল আধার সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁরা নীচুতলার মানুষজনদের মধ্যেও এই শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে সচেষ্ট হন, যাতে তারা নিজেরাই ত্রুটিগুলো ধরতে পারেন। এই সময় ধর্মান্তরিত বেশ কিছু ব্রাহ্মণ তাদের উপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করেননি, এদের অনেক সময়ই খ্রিষ্ট পন্ডিত বলা হতো (শিবাসুন্দরম, পৃ. ১১১-১৪৫)। কেরিরা ধর্মের প্রসারের সাথে শিক্ষার প্রসারকে

সমার্থক করে দেখেছিলেন, অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করার মধ্য দিয়েই উন্নত একেশ্বরবাদী চর্চা গ্রহণ করা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করেন। কলেজে প্রকৃতি চর্চা ও উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাসে কেরিকে আশপাশের পরিবেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায়। মার্শম্যানের হিন্টস থেকে আমরা জানতে পারি পৌত্তলিকতাকে প্রশ্ন করেই সেসময়কার মিশন মাটি ও প্রকৃতির নানান উপাদানের বাস্তব অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা শুরু করে বস্তুবাদী এই শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয়দের প্রকৃতি পূজার বহু ঈশ্বরবাদী পরিসরকে ভেঙে ফেলতে পারবেন মনে করেছিলেন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভারতীয়করণ, মালিদের ভূমিকা ও শ্রীরামপুর বাগানের শেষের দিন:

হর্টস বেঙ্গলেনসিসের ভূমিকায় কেরিকে আমরা এক নব্য মিশ্র জ্ঞানের পরিসর নিয়ে ধারণা দিতে দেখতে পাই। তবে জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত 'হিন্দুস্তানের ক্ষেত্র বাগানের কৃষিকর্মের কৃতকার্যের বিবরণ পুস্তকে' আমরা দুই জ্ঞানের সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট ধারণা পাই। এই বইটির ২৪তম অধ্যায়ে জন লেস্টার রাজা মিত্রজিতের উদ্যান বিদ্যা সংক্রান্ত উপদেশাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এতে মূলত ভারতীয় কৃষিতে জ্যোতিষের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই লেখার ভূমিকায় লেস্টার ইউরোপীয় যুক্তিবাদী সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, এর থেকে যে ব্যবহারযোগ্য জ্ঞানও নেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি আশাপ্রকাশ করেছেন, এই লেখায় ফুলে গন্ধ আনা ও ফলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য দেশীয় টোটকাগুলিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিছুটা অগ্নিপুরানের ধাঁচে এ লেখাতে গাছের ফল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মধু ও ঘি দিয়ে স্নান করানোর কথা লেখা হয়েছে, বকুল গাছের পাতা ঝরে যাওয়া রোধ করতে সুন্দরী রমণীর নখের আঁচড়ের ব্যবহারের মতো প্রচলিত অভ্যাসের কথাও আমরা এ লেখা থেকে জানতে পারি (হিন্দুস্তানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষি সমাজের কৃতকর্মের বিবরণ, ১৮৩১, পৃ. ১৪০)। এমন সব জিনিসপত্রকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বইতে জায়গা দেওয়ার কারণ মুখ্যত এদেশীয় অজানা আবহাওয়া বুঝে একটা মিশ্র ব্যবস্থা তৈরি ছাড়াও এই অধ্যায়কে রাখার পিছনে ছিল আপন বিজ্ঞানকে বৈধতা প্রদানের জায়গাও, কেরিদের অন্তরে যেহেতু ধর্ম প্রচারের এক উদ্যোগ ছিল, তাই তাঁরা বাংলায় জ্ঞানের প্রসার চেয়েছিলেন, বাংলায় যে পাঠক এ লেখা পড়বেন,পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে এদেশীয় জ্ঞানতত্ত্বের রেফারেন্সে সামনে আনতে পারলে যে এখানকার লোকজন তা আরো সহজে নিতে পারবে সে কথা এনারা ভালোই বুঝেছিলেন। উদ্ভিদ বিদ্যা ছাড়াও সৌরজগৎ, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা কালে তাঁরা বারংবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাথে সাথে জুড়ে দিয়েছেন এখানকার জ্যোতিষের নানা তথ্য। জন ক্লার্ক মার্শম্যান তাঁর জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় বইটিতে সৌরজগতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টেনে এনেছিলেন ভাস্করাচার্যের সূর্যসিদ্ধান্তের উপাখ্যান (জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়, ১৮১৯, পৃ. ১৬)। এই সময় পুরানে উল্লেখিত সুমেরু,কুমেরু, কৈলাশ পর্বত প্রভৃতির মতো বিষয়গুলির বাস্তব অবস্থান সম্পর্কেও মিশনারীরা লেখালেখি শুরু করেন, মিশনের ভূগোল বইটির হিন্দি অনুবাদ এই সময়ে উত্তরপ্রদেশ,বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে, বিশেষত হরিদ্বারে এই চর্চাকে সন্ন্যাসী ও জ্যোতিষীরা তাদের বিদ্যার পরবর্তী অংশ হিসেবেই দেখতে শুরু করেন (রামস্বামী, পৃ. ২৩৯)। শুধুমাত্র ধর্মের প্রচার বা বিজ্ঞানের প্রসারই নয় বরং অর্থ উপার্জনেরও এক মোক্ষম ক্ষেত্রের সন্ধান পান কেরিরা, ১৮১৯ সালের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত শ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞাপনে সূর্যসিদ্ধান্ত ও লীলাবতী অনুযায়ী ভূগোলের পাঠদানের কথা লেখা হয়।

হিন্দুস্তানের ক্ষেত্র বাগানের বিবরণের ২৪তম অধ্যায়ের আলোচনায় আবার কিঞ্চিৎ ফেরত যাওয়া দরকার, উদ্ভিদবিদ্যায় এই মিশ্র ব্যবস্থাটাকে আরো একটু বিস্তারে বুঝে নিতে, এই অধ্যায়ে রাজা মিত্রজিৎ সার হিসেবে পশুর হাড় ও সেদ্ধ করা গোমাংসের কথা বলেছেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজের মালীদের কাছে এই ধরণের অনুশীলন ছিল সম্পূর্ণ ধর্ম বিরুদ্ধ, কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে বা বিদেশী গাছেদের বাঁচাবার জন্য এই ধরণের সারের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কেরিরা অনুভব করতে পেরেছিলেন। এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে

প্রকাশ পাওয়া বইতে পুরাণসিদ্ধ এই সব আলোচনা তাদের অভ্যাসের বদলের জন্যেও ঘটে থাকতে পারে, অনেকটা রামমোহনের মতো শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্র বদল। ১৮৭৭ সালে রচিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কৃষি দর্পণ বইটিতে, ধর্মের বাধা কাটিয়ে উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে এই ধরণের সারের ব্যবহার নিয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, এর থেকেই পূর্বোক্ত গ্রন্থের আলোচনার জোর টের পাওয়া সম্ভব। পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুবাদ শ্রীরামপুর মিশনের ক্ষেত্রে কোনো সহজ অনুবাদ ছিল না বরং তার সাথে জড়িয়ে ছিল তাদের ধর্মের ভাষা, বৈধতার প্রশ্ন।

শ্রীরামপুরে উদ্ভিদ বিদ্যা অনুশীলনের ক্ষেত্রে মালিরা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, প্রথমদিকে মালিদের দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, স্থানীয় সংগ্রাহকদের তুলনায় মালিদের উপর তার অনেক বেশি ভরসা ছিল। ১৭৯৬ সালে সুটক্লিফকে লেখা চিঠিতে তিনি মালিদের ভরসযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। কেরি এদেশে আসা ইস্তক এক মিশ্র ব্যবস্থার দরকার বুঝতে শুরু করেন, মালিরাই যে হাতের কাছে থাকা সবচেয়ে দক্ষ শ্রেণী তাও তিনি বুঝতে পারেন। শ্রীরামপুর উদ্যানে তাই এই মিশ্র দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি, কলমের মতো বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশন এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ১৮২০'র দশকে কেরির প্রতিষ্ঠা করা এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির মূল উদ্যোগের জায়গাতেও

মালীদের কথা ভাবা হয়েছিল, মূলত আবহাওয়া বুঝে বিদেশি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই জাতির গুরুত্ব অনুধাবন করেই তাদের উৎসাহ বাড়াতে বীজ সরবরাহ, পুরস্কার প্রদানের মতো বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রীরামপুরেও মালিদের গুরুত্ব একইভাবে লক্ষ্য করতে পারি, শ্রীরামপুর কলেজের লেখাজোখা থেকেই প্রায় ৫০জন মালির নিযুক্তির কথা জানা যাচ্ছে। কেরির প্রধান মালী হলধরের কথা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮৮১ সালে শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপাল এলবার্ট উইলিয়ামসের অশীতিপর হলধরকে নিয়ে লেখায়, তাঁর বিজ্ঞানসম্মত নাম সম্বন্ধে দক্ষতা নিয়ে আমরা জানতে পারি, সেইসময় হলধর ২৫০টিরও বেশি গাছের ল্যাটিন নাম অনর্গল বলতে পারতেন, জর্জ স্মিথের লেখা থেকে আমরা হলধরের বাঁধাকপি চাষজনিত খ্যাতির ব্যাপারে জানতে পারি। এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির বেশ কিছু রিপোর্টে হলধরের নাম আমরা লক্ষ্য করতে পারি, ১৮২২ ও ১৮২৮'র রিপোর্ট থেকে আমরা হলধরের সুগার লোফ ক্যাবেজ ও বিলাতি আলু চাষের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির কথাও জানতে পারি। কেরি তাঁর মালিদের সাথে আজীবন যুক্ত ছিলেন, জন কেরির স্মৃতিচারণা থেকে আমরা কেরির শেষ জীবনে মালিদের সাথে যোগাযোগের বিষয়ে জানতে পারি।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই মূলত আবহাওয়া জনিত কারণে শ্রীরামপুর হয়ে উঠেছিল অবসর যাপনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য জায়গা, শ্রীরামপুরে কবরস্থ ইউরোপীয় পরিবারগুলোর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানা থাকলেই সেসব সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয়, শুধু ইউরোপীয়রাই নয় বরং স্থানীয় উচ্চবিত্তরা পৌরুষের নতুন মাধ্যম হিসেবে সৃজনকে বেছে নেন, কেরিদের সাথে সাথেই এই চর্চা এক সামাজিক নেশার আকার ধারণ করে। শ্রীরামপুর ও তার সন্নিকটস্থ এলাকায় হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের লোকজনদের বাগানও আমরা দেখতে পাই, সাইমন রাস্টিনের ভাষ্য অনুযায়ী ধীরে ধীরে শ্রীরামপুর হয়ে উঠেছিল কলকাতার সবুজ শহর, এর সাথে সাথে ব্যারাকপুর থেকে অবসর কাটাতে আসা সেনাকর্মীদের গুরুত্বের কথাও বলতে চাইবো। বাগান শ্রীরামপুরের নগর চরিত্র বদলে দিয়েছিল, ১৮৪০ সালের ড্যানিশ সেনসাস অনুসারে এ শহরে ১০৭৬ জন মালি ছিলেন, এর থেকেই এই চর্চার ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি, এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, পিয়ার্স কেরির কথায় এ সময়ে শ্রীরামপুরের কলেজের মালিরা অতিরিক্ত অর্থের জন্য অবসর সময় অন্যান্যদের বাগানে ব্যয় করতে শুরু করেন, এতে কেরির বিদ্যা আরো প্রসার লাভ করে। দিনেমার কাচারী রিপোর্ট থেকে আমরা তাঁদের বিশেষ চাকর হিসেবে 'বারি' পদবীর লোকজনদের কথা পাই, উৎস খুঁজলে মূলত উড়িষ্যা নিবাসী হিসেবেই এদেরকে দেখতে পাবো, পরবর্তীতে এই বারিরাই বংশ পরম্পরায় শ্রীরামপুর কলেজের মালির কাজে নিযুক্ত থেকেছেন,

এখনো আছেন। টি.সি ফার্মিঞ্জারের ১৮৫০'র দশকের গার্ডেনিং ম্যানুয়ালে ১৮৪১ সালের কলকাতার কোভেন্ট গার্ডেন রোডের মার্কেট মালিদের কথা লেখা হয়, এই মালিরা মূলত মালিকের বা অন্য কারোর জমিতে বিদেশি ফসল ফলিয়ে সেসব বাজারে নিয়ে আসতো, এরা প্রচুর বিদেশি ফুল, ফলকে জনপ্রিয়তা প্রদান করে, একইভাবে লন্ডনের কোভেন্ট গার্ডেন রোডে মালিদের বাজার নিয়ন্ত্রণের কথা শুনতে পাই, এখানে উল্লেখ্য উনিশ শতকে শ্রীরামপুরেও একটি কোভেন্ট গার্ডেন রোড (বর্তমান রবীন্দ্র ভবন রোড)-এর অস্তিত্ব ছিল, তার সাথেও মালিদের বিদেশি ফসল বিক্রির সম্বন্ধের সম্ভাবনা রয়েছে, জনশ্রুতি সেদিকেই নির্দেশ করছে। ড্যানিশ ফ্রেডরিকনগর রিপোর্ট ৬৯-৭১'র সূত্রে আমরা সেসময় শ্রীরামপুরের অনেক বাগানে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি, মালির সংখ্যা দেখে মার্কেট মালির এই শহরে অবস্থিতি নিয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ডেনিশ পাট্টা বা ফ্রেডরিকনগর রিপোর্ট ৬৯-৭১'র সূত্রে শ্রীরামপুরের বেশ কিছু উচ্চবিত্তদের বাগানের নাম আমরা পাই, হরচন্দ্র লাহিড়ী, রামধি লাহিড়ী দিগর, গৌরমোহন গোস্বামীর বাগান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, সাহেবদের বাগানের মধ্যে মিল্টু সাহেবের বাগান এই সব পাট্টায় বেশ কিছুবার স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে হেমচন্দ্র লাহিড়ীর পার্ক শৈলীর বাগান, ক্ষেত্রমোহন সা'র বাগান, তুলসী গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ির বাগান প্রভৃতি শ্রীরামপুরে যথেষ্ট নামডাক করেছিল। ক্ষেত্র সা রোডের মেলবাড়িতে শিবরাত্রির মেলায় তাঁর শুরু করা সবজির প্রদর্শনী এখনো হয়ে আসছে, এর থেকে সেসময়কার শ্রীরামপুরের বাগান সম্বন্ধিত উৎসাহের ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারি। ১৮৬০'র দশকে অর্থের অভাবে শ্রীরামপুর উদ্ভিদ উদ্যান বিক্রি হয়ে গেলেও, তার দর্শনের অস্তিত্ব শ্রীরামপুরে বর্তমান ছিল।

উপসংহার:

সুজিত শিবাসুন্দরমও কেরিকে স্বাভাবিক প্রাচ্যবাদী হিসেবে দাগিয়ে দিতে পারেননি, এর কারণ ছিল ধর্ম। অর্থের প্রয়োজনে কেরিরা কোম্পানির কাজে অংশ নিলেও জ্ঞানচর্চা ও ধর্মই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শের মূল। ধর্মের মাধ্যমে স্থানীয়দের উন্নতিই ছিল কেরির জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বারবার শ্রীরামপুর মিশনের বিজ্ঞানচর্চার এক ভিন্ন ক্ষেত্রের ধারণা দেওয়া চেষ্টা করা হয়েছে, কেরিদের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক দর্শনের বাইরেও অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, মুক্তিতত্ত্বের মতো বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল। কেরিরা স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে তাদের মৌলিক চরিত্রের বদল ঘটাতে উৎসুক হয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, বস্তুগত ধারণা প্রদানের মধ্যে দিয়ে তারা অন্য আরেক ধরণের আধ্যাত্মিকতা প্রচারের দায় নিয়েছিলেন। কেরিদের উদ্ভিদবিদ্যা বা উদ্যানবিদ্যার চর্চা স্বাভাবিক শৃঙ্খলের বাইরে গিয়ে এক বিস্তীর্ণ যোগসূত্র গড়ে তুলতে পেরেছিল, এই চর্চা শ্রীরামপুরকে বিশ্ব মানচিত্রে এক নতুন জায়গা করে দিয়েছিল। ধর্ম প্রচারের স্বাভাবিক মাধ্যমকে খানিকটা এড়িয়ে অন্যরকম ভাবেই তাঁরা তাঁদের প্রচার চালিয়েছিলেন, অনেকসময় এসব কিছুই ধর্মকে উত্তীর্ণ করে স্বাভাবিক আবেগের জায়গা থেকেও প্রকাশিত হয়েছিল, এই কারণেই লন্ডনের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের সাথে কেরিদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, কেরিরা স্থানীয় খ্রীস্টানদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হলেও ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ তা মানতে রাজি ছিল না। উইলিয়াম কেরির জ্ঞান লাভের লিপ্সা তাঁকে সবকিছুকে অতিক্রম করে যেতে সাহায্য করেছিল। শ্রীরামপুর ন্যাথানিয়েল ওয়ালিক, অটো ফইখতদের মতো যোগ্য উদ্ভিদবিদদের জন্যও মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল, ধর্ম তাদের চর্চার মধ্যে থাকলেও, জ্ঞানলিপ্সাকে কোনোকিছুই ছাপিয়ে যেতে পারেনি।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কেরি, এস.পি। (১৯২৩)। উইলিয়াম কেরি। ডি.ডি., ফেলো অব লিনিয়ান সোসাইটি। এইচ এন্ড এস।

২. কেরি, এস. পি। (১৯৪২)। উইলিয়াম কেরি। কেরি প্রেস।

৩. কেরি, উইলিয়াম। (১৭৯২)। এন এনকোয়েরি ইনটু দ্য অবলিগেশন অব খ্রিস্টানস টু ইউজ দ্য মিনস ফর দ্য কনভার্সন অফ দ্য হিদেনস। প্রিন্টেড বাই এন আয়ারল্যান্ড।

৪. কেরি, উইলিয়াম। (১৮১১)। রিমার্কস অন দ্য স্টেট অব তার এগ্রিকালচার ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব দিনাজপুর। এশিয়াটিক রিসার্চেস, ১০, ১-২৬।

৫. কেরি, উইলিয়াম. (১৮২০). এড্রেস রেস্পেকটিং এন এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া. দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া (কোয়াটারলি), ৫২।

৬. জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়। (১৮১৯). শ্রীরামপুর।

৭. তাবোলাচ্চি, লরা। (২০১৯)। এগ্রিকালচার এস রিডেম্পসন। ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী, এগ্রিকালচারাল এলিট এণ্ড এগ্রি-হর্টিকালচারাল ইমপ্রুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া। ১৭৯৩-১৮৪০ [অপ্রকাশিত ডক্টরাল ডিসার্টেশন]। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ডেভিস।

৮. তাবোলাচ্চি, লরা। (২০১৯)। ভেজিটেবল গার্ডেন ভার্সেস ক্যাশ ক্রপস: সায়েন্স এন্ড পলিটিকাল ইকোনমি ইন দ্য এগ্রিকালচারাল এন্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া। ১৮২০- ৪০। হিস্ট্রি ওয়ার্কশপ জার্নাল, ৪০-৪১।

৯. নাগার, খ্যাতি। (২০১৩)। বিটুইন ক্যালকাটা এন্ড কিউ : দ্য ডাইভারজেন্ট কালেকশন এন্ড প্রোডাকশন অব হর্টাস বেঙ্গলেন্সিস এন্ড ফ্লোরা ইন্ডিকা. এল. বার্নার্ড, এম. গর্ডন, ও এস. লেরি (সম্পা.), দ্য আর্লি মডার্ন টু দ্য টোয়েনটিয়েথ (পৃ. ১৫৩). ব্রিল।

১০. ম্যানলি, কিন। (২০০৪)। ফ্রম উইলিয়াম কেরি ইন ইন্ডিয়া টু রোল্যান্ড হাসল ইন অস্ট্রেলিয়া। ব্যাপ্টিস্ট কোয়াটারলি, ৪০(৬), ৩২৬-৩৪৫।

১১. মার্শম্যান, জন ক্লার্ক। (১৮৫৯)। দ্য লাইফ এন্ড টাইমস অব কেরি। মার্শম্যান এন্ড ওয়ার্ড: এমব্রেসিং দ্য হিস্ট্রি অব শ্রীরামপুর মিশন। লংম্যান, ব্রাউন, গ্রীন, লংম্যান্স, ক্যাম্প; রবার্টস।

১২. রামস্বামী, সুমথি। (২০১৭)। টেরেস্ট্রিয়াল লেসেন্স: দ্য কংকোয়েস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড এস গ্লোব ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস।

১৩. শিবাসুন্দরম, সুজিত। (২০০৭)। খ্রিস্টিয়ান বেনারস: ওরিয়েন্টালিজম, সায়েন্স এন্ড দ্য শ্রীরামপুর মিশন অব বেঙ্গল. ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ৪৪(২), ১১১-১৪৫।

১৪. স্মিথ, জর্জ। (১৯৩৫)। লাইফ অব উইলিয়াম কেরি (রিস আর্নেস্ট, সম্পা.)। এভরিম্যানস লাইব্রেরি।

১৫. হিন্দুস্তানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষি সমাজের কৃতকর্মের বিবরণ (১ম খণ্ড)। (১৮৩১)। শ্রীরামপুর মুদ্রাঙ্কিত।